কৃষক আন্দোলন যেন নতুন তত্ত্ব নিয়ে এল

প্রভাত পটনায়েক

বাস্তব পৃথিবীতে আমরা একের পর এক চমকপ্রদ তত্ত্বের আবির্ভাব হতে দেখেছি। আজকে এমনই এক চমকপ্রদ বিষয় নিয়ে আলোচনার প্রয়াস নিয়েছি। বামপন্থা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় এক বহুচর্চিত প্রশ্ন হল— গ্রামীণ ভারতে ভূস্বামী-আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কৃষক (যাঁদের মধ্যে অবস্থাপন্ন কৃষকরাও রয়েছেন) এবং (ক্ষেতমজুরদের কীভাবে ঐক্যবদ্ধ করা হবে। ভারতের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে কৃষক এবং ক্ষেতমজুরদের মধ্যে নানা বিষয়ে দ্বন্দ্ব রয়েছে। যখনই সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী এবং বাকি গ্রামবাসীদের মধ্যে সংঘাত নিয়ে আলোচনা করা হয়, তখনই কিন্তু এই দ্বন্দ্ব এক বিরাট প্রশ্নচিহ্ন হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। বামপন্থী কৃষক সংগঠনগুলি বহুবার অন্যান্য অবাম কৃষক সংগঠনের সঙ্গে আঁতাতবদ্ধ হয়ে আন্দোলন সংগঠিত করেছে। ঐ সব আন্দোলনের সময় বামপন্থীরা ক্ষেতমজুরদের স্বার্থবাহী দাবিদাওয়া অন্তর্ভুক্ত করে তাদের যৌথ আন্দোলনে শামিল করতে চাইলেও আঁতাতবদ্ধ অন্যান্য কৃষক সংগঠনের আগ্রহ না থাকায় সেটা সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

কৃষক এবং ক্ষেতমজুরদের মধ্যে থাকা দ্বন্দ্বে একটা বড় অংশ আর্থিক লাভালাভের সঙ্গে জড়িত। ক্ষেতমজুররা শ্রমের বিনিময়ে বেশি মজুরি চাইবেন এবং সেটা কৃষকের স্বার্থবিরোধী দাবি—এটা মোটামুটি সবাই জানেন। কিন্তু আর্থিক বিষয় ছাড়াও এই দ্বন্দ্বে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা রয়েছে — আর সেটি হল বর্ণভেদজনিত। ক্ষেতমজুররা প্রধানত দলিত অংশের মানুষ, অন্যদিকে কৃষকরা সাধারণত দলিত ছাড়া অন্যান্য বর্ণের হয়ে থাকেন। বস্তুত ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে, বিশেষত উত্তর ভারতে, দলিতদের ভূসম্পত্তির অধিকারী হতে দেওয়া হয় না।

দিল্লির চারপাশের অঞ্চলে এই দ্বন্দ্ব কার্যত তীব্র জাঠ-দলিত সংঘাতে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। সত্তরের দশকে দিল্লির নিকটস্থ কানঝাওয়ালা গ্রামে জাঠ কৃষক এবং দলিত ক্ষেতমজুরদের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দিয়েছিল। সেখানে প্রতিবাদী ক্ষেতমজুররা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে সংগঠিত হয়েছিলেন। ভারতীয় পটভূমিতে বিপ্লব সংগঠিত করতে হলে কী ধরনের সমস্যার মোকাবিলা করে এগোতে হবে, তার সম্যক দৃষ্টান্ত এই বিরোধ।

নরেন্দ্র মোদি সরকারের চালু করা তিন নয়া কৃষি আইনের বিরুদ্ধে কৃষকদের চলমান আন্দোলন এই আপাত-অসম্ভব কাজটিকেই সম্ভব করে দিয়েছে। এই আন্দোলন কৃষক এবং ক্ষেতমজুরদের এক মঞ্চে এক সারিতে এনে দাঁড় করিয়েছে। গত ৫ সেপ্টেম্বর তারিখে মুজফফরনগরে যে 'কিসান মহাপঞ্চায়েত' অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার উদ্যোক্তারা যথার্থভাবে ঘোষণা করেছেন, তাঁদের কর্মসূচিতে 'সকল শ্রেণি', 'সকল বর্ণ' এবং 'সকল ধর্ম' থেকে মানুষ অকাতরে সমর্থন করেছেন। উল্লেখ্য, গত ২৭ সেপ্টেম্বর সংগঠিত ভারত বন্‌ধ-এর প্রতি বহুজন সমাজ পার্টিও সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল। যদিও এই দলের একলা-চলো-রে প্রবণতা উত্তর ভারতের নির্বাচনী চিত্রে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা সৃষ্টির সংকেত দিচ্ছে।

কৃষক আন্দোলনের সংগঠনে চমকপ্রদ ও অভাবনীয় সাফল্যের মধ্যে শুধুমাত্র কৃষক-ক্ষেতমজুর ঐক্যই নয়, আরো অন্তত দু'টি বিষয় উল্লেখের দাবি রাখে। প্রথমটি হল আন্দোলনে ব্যাপক সংখ্যায় নারীদের অংশগ্রহণ। জাঠ কৃষক নারীদের নিয়ে বহু প্রবাদ চালু আছে, কিন্তু বাস্তব হল তারা যুগ যুগ ধরে কঠোর পিতৃতান্ত্রিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে রয়েছেন। সেই তাঁরা যখন দলে দলে ঘর থেকে বেরিয়ে বিপুল সংখ্যায় আন্দোলনে শামিল হন, তখন সেটা সত্যিই এক অভূতপূর্ব ও হতবাক করা ঘটনা হয়ে ওঠে।

আরেকটি বিষয় হল সংশ্লিষ্ট এলাকায় জাঠ ও মুসলিমদের মধ্যেকার সম্পর্ক। অতীতে এই দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে সুসম্পর্ক থাকলেও ২০১৪ সাধারণ নির্বাচনের আগে বর্তমান শাসক দলের কেরামতিতে এই সম্পর্ক তিক্ততম হয়ে ওঠে। বিগত ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে কয়েকটি সাম্প্রদায়িক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মুজফফরনগরে এক মহাপঞ্চায়েত অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচিকে ব্যবহার করে তীব্র সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ সম্পন্ন করা হয়, যার পরিণতিতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে মারাত্মক দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। এই মেরুকরণ এবং রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার মধ্য দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি ভোটের বাক্সে বিরাট লাভ কুড়োতে সক্ষম হয়, যা ঐ দলকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে সহায়তা করে। কিন্তু চলমান কৃষক আন্দোলন আবার এই দুই সম্প্রদায়কে এক সঙ্গে এনে মিলিয়েছে। দু'পক্ষই ঘোষণা করেছে, গত সাত বছরে যে ভুল করেছে তারা, আর এমন ভুল কখনো হবে না।

অর্থাৎ এই কৃষক আন্দোলনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ বর্ণভিত্তিক, ধর্মভিত্তিক এবং লিঙ্গভিত্তিক সংঘাত দূরে সরিয়ে রেখে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। শুধু তাই নয়, সরাসরি কৃষকস্বার্থবাহী দাবি দাওয়া ছাড়াও অন্যান্য গণতান্ত্রিক বিষয় নিয়েও এই আন্দোলন সুস্পষ্ট বার্তা দিয়েছে। সরকারের 'নগদীকরণ' (মনেটাইজেশন) পরিকল্পনাই হোক, বা রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদের বেসরকারিকরণই হোক, বা ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর আক্রমণই হোক, বা সমালোচক তথা বিরোধীদের উপর ই ডি (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট) অথবা সি বি আই (সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন) লেলিয়ে দেওয়াই হোক, বা অসংখ্য প্রতিবাদীকে বছরের পর বছর ধরে বিনা বিচারে জেলে আটকে রাখাই হোক (ভীমা কোরেগাঁও মামলা স্মরণ করুন), কৃষক আন্দোলন প্রতিটি অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। সারা দেশের স্বার্থজড়িত গণতান্ত্রিক বিষয়গুলি নিয়ে কোনো কৃষক আন্দোলন লাগাতার সরব ভূমিকা পালন করে চলেছে, এমনটা এর আগে কখনো হয়নি।

মার্কসীয় তত্ত্ব অনুসারে যুগপরিবর্তনকারী মহামানবসম ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব শ্রমিক শ্রেণির উপর ন্যস্ত। কৃষকরা সেখানে খুব বেশি হলে শ্রমিকশ্রেণীর মিত্রশক্তি হয়ে থাকবেন, কিন্তু মূল দায়িত্ব কখনোই কৃষকদের উপর ন্যস্ত হয় না। একটা কথা প্রায়ই বলা হয়— কৃষকরা যখন উপনিবেশবাদ-বিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তখন তাঁদের ধারণায় এটা ছিল না যে, উপনিবেশবাদী শাসনের অবসান হলে কী চেহারার সমাজ গঠন করতে হবে। কিন্তু এখন আমরা যে কৃষক আন্দোলন প্রত্যক্ষ করছি, তা ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রকে রক্ষা করার আহ্বান তো রেখেছেই, পাশাপাশি সংবিধান খর্ব করার সবরকম প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেও গর্জে উঠেছে। অথচ শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি, যাঁদের আমরা সচেতন ও গণতন্ত্রকামী জনগোষ্ঠী বলে জানি, তাঁরা কিন্তু সংবিধান খর্ব করার ন্যক্কারজনক রাষ্ট্রীয় প্রয়াসের মুখেও নির্লিপ্ত ও উদাসীন হয়ে রয়েছেন, অনেকেই আবার সহযোগী ভূমিকাও পালন করছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বিশিষ্ট অর্থশাস্ত্রবিদ জন মেনার্ড কেইনস এই শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে 'শিক্ষিত বুর্জোয়া' বলে আখ্যায়িত করে আশা প্রকাশ করেছিলেন, রাষ্ট্রকে যুক্তিনির্মিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব পালন করবেন তাঁরা।

স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন ওঠে, মানুষের যে শ্রেণিকে প্রায়শই 'গ্রামীণ জ্ঞানহীনতার আধার' বলে পিছনের সারিতে ফেলে রাখা হয়, সেই শ্রেণিই কী ভাবে তুলনামূলকভাবে বেশি 'প্রগতিশীল' হিসাবে পরিচিত শ্রেণিকে পিছনে ফেলে গণতন্ত্র এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধ রক্ষার লড়াইয়ে আগুয়ান হয়ে উঠল?

এই প্রশ্নের উত্তরের একটা অংশ রয়েছে মানুষের এই শ্রেণিটি বর্তমানে যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির মোকাবিলা করছে, সেই পরিস্থিতির মধ্যে। পুঁজিবাদের সমসাময়িক দশাকে বলা যেতে পারে একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগ। এই যুগে একচেটিয়া পুঁজির আগ্রাসী হানার সামনে অসহায় শিকারের মত খুচরো উৎপাদকরাও পড়ে গেছে, যাদের মধ্যে অন্যতম হল কৃষকচালিত কৃষিকাজ। কৃষকরা আগে শুধুমাত্র ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন, এখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একচেটিয়া পুঁজিপতির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই। মনে রাখতে হবে, এই একচেটিয়া পুঁজিপতিরা সমাজের সবচেয়ে 'উন্নত' অংশ।

ভারতে যখন থেকে নয়াউদারবাদী নীতি অনুসরণ করা শুরু হয়েছে, তখন থেকেই কৃষিক্ষেত্রে একচেটিয়া পুঁজির প্রবেশ গতিলাভ করেছে। এর আগে দেশের অর্থনীতি বহুলাংশে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকত (অর্থশাস্ত্রের ভাষায় যাকে বলা হয় 'ডিরিজিস্ট রিজিম'), এবং তখন কৃষকচালিত কৃষিকাজকে একচেটিয়া পুঁজির জবরদখল থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করত রাষ্ট্র। কিন্তু দেশে নয়াউদারবাদের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের এই সুরক্ষার অবসান ঘটে। তখন কৃষি সরঞ্জামের দামে ভর্তুকি কমতে শুরু করল, অর্থকরী ফসলে (ক্যাশ ক্রপ) সহায়ক মূল্য তুলে নেওয়া হল, ঐ সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুযোগ সংকুচিত হতে থাকল। এর পরিণামে কৃষি ক্রমেই অলাভজনক হয়ে উঠতে শুরু করল, পাশাপাশি কৃষকের ঘাড়ে ক্রমবর্ধমান দেনার বোঝা ক্রমেই চেপে বসতে থাকল। উপায়ান্তর না দেখে একের পর এক 'অন্নদাতা' আত্মহননের পথ বেছে নিতে বাধ্য হলেন।

কৃষকের জন্য রাষ্ট্র এখনও যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সুরক্ষাকবচ বজায় রেখেছে (যেমন খাদ্যশস্যের সহায়ক মূল্য), তিন নয়া কৃষি আইন চালু হলে সেটুকুও বিলুপ্ত হবে। অর্থাৎ কৃষকচালিত কৃষিকাজকে এখন একচেটিয়া পুঁজির করাল গ্রাসের সামনে অসহায় খাদ্য রূপে ফেলে দেওয়া হয়েছে। দেশি-বিদেশি একচেটিয়া ও বৃহৎ ব্যবসাকেন্দ্র যে বিরাট হাঁ করে কৃষকদের গিলে নিতে আসছে, তার বিরুদ্ধে কোণঠাসা কৃষকদের মরণপণ লড়াই ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরের অন্য অংশ নিহিত রয়েছে এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের মধ্যেই। কৃষকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখতে পেল সারা দেশ—বর্ণভিত্তিক, সম্প্রদায়ভিত্তিক আর পিতৃতান্ত্রিক ধ্যানধারণার ঊর্ধ্বে উঠে তাঁরা নিশ্চিত করলেন এক বিশাল ঐক্য। সত্যিই সুমহান ও ঐতিহাসিক এই আন্দোলন!

(সৌজন্য: দ্য টেলিগ্রাফ: ৭ অক্টোবর,২০২১)